ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৩য় পত্র: আত তাফসীরুল ফিকহী-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

سورة سبأ (সূরা সাবা)

৬০. اذكر وجه التسمية لسورة سبا - [সূরা সাবা-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।]
৬১. اكتب موضوعات سورة سبا مختصرا - [সূরা সাবা-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।]
৬২. ما المراد بقوله تعالى "افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم ... الاية"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم-এর মর্মার্থ কী?]
৬৩. ما هو الفضل الذى اوتى داود عليه السلام - [দাউদ (আ)-কে কী মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল?]
৬৪. لاى نبى الين الحديد؟ - [কোন নবীর জন্য লোহাকে নরম করে দেওয়া হয়েছিল?]
৬৫. ما معنى قوله تعالى "وما ارسلناك الا كافة للناس ... الاية"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وما ارسلناك الا كافة للناس-এর মর্মার্থ কী?]
৬৬. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة سبا - [সূরা সাবা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।]

سورة فاطر (সূরা ফাতির)

৬৭. اذكر وجه التسمية لسورة فاطر - [সূরা ফাতির-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।]
৬৮. اكتب موضوعات سورة فاطر مختصرا - [সূরা ফাতির-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।]

৬৯. "بين سبب نزول قوله تعالى "افمن زين له سوء عمله فراه حسنا - [মহান আল্লাহর বাণী افمن زين له سوء عمله فراه حسنا শানে নুযুল বর্ণনা কর।]
৭০. ما معنى قوله تعالى "وما يعمر من معمر ولا ينقص"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وما يعمر من معمر ولا ينقص-এর মর্মার্থ কী?]
৭১. بين الايات التى ذكرت فى قوله تعالى "وما يستوى البحران هذا عذب فرات" - [মহান আল্লাহর বাণী وما يستوى البحران هذا عذب فرات-এর মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি বর্ণনা কর।]
৭২. اشرح قوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر اخرى" - [মহান আল্লাহর বাণী ولا تزر وازرة وزر اخرى-এর ব্যাখ্যা কর।]
৭৩. اوضح قوله تعالى "انما يخشى الله من عباده العلماء" - [মহান আল্লাহর বাণী انما يخشى الله من عباده العلماء-এর ব্যাখ্যা কর।]
৭৪. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة فاطر - [সূরা ফাতির থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।]

سورة يس (সূরা ইয়াসীন)

৭৫. اذكر وجه التسمية لسورة يس - [সূরা ইয়াসীনের নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।]
৭৬. اكتب موضوعات سورة يس مختصرا - [সূরা ইয়াসীনের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।]
৭৭. ما معنى لفظ "يس"؟ هل يجوز تسمية احد ب "يس"؟ - [يس শব্দের অর্থ কী? কারও নাম يس রাখা বৈধ কি না?]
৭৮. بين فضيلة سورة يس - [সূরা ইয়াসীনের ফযিলত বর্ণনা কর।]
৭৯. اى سورة سميت بقلب القران؟ - [কোন সূরাকে আল কুরআনের হৃদয় বলা হয়?]
৮০. ما المراد ب "صراط مستقيم" فى "سورة يس"؟ - [সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত صراط مستقيم দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৮১. حقق "الرحمن الرحيم" - [الرحمن ও الرحيم শব্দের বিশ্লেষণ কর।]

৮২. اكتب قصة اصحاب القرية بالاختصار - [اصحاب القرية-এর কাহিনি সংক্ষেপে লেখ।]
৮৩. من هم المرسلون الى اصحاب القرية؟ بين حالتهم - [জনপদবাসীদের প্রতি কাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল? তাদের অবস্থান বর্ণনা কর।]
৮৪. قالوا طائركم] - قوله تعالى "قالوا طائركم معكم ما معنى طائركم"؟ [طائركم معكم আয়াতের طائركم-এর অর্থ কী?]
৮৫. ما اسم الرجل الذى جاء من اقصى المدينة؟ - [নগরীর উপকণ্ঠ থেকে আগত ব্যক্তিটির নাম কী?]
৮৬. كيف قالت الفلاسفة ان الارض تتحرك والشمس والقمر ساكنان والله يقول والشمس تجرى لمستقرلها - والقمر قدرناه منازل؟ اوضح - [দার্শনিকগণ কীভাবে বলেন যে পৃথিবী ঘোরে, সূর্য ও চাঁদ স্থির, অথচ আল্লাহ বলেন- والشمس تجرى لمستقرلها والقمر قدرناه منازل? বিশ্লেষণ কর।]
৮৭. ما هو مستقر الشمس واين هو؟ هل الشمس تستقر فى موضع وتنقطع جريها ام لا؟ - [সূর্যের বিশ্রাম পথ কোনটি এবং কোথায় অবস্থিত? সূর্য কি একই স্থানে স্থির, না পরিভ্রমণ করে?]
৮৮. منازل القمر كم هى؟ وما هى؟ - [চাঁদের মঞ্জিল কয়টি ও কী কী?]
৮৯. اكتب التعليمات الحاصلة عن سورة يس - [সূরা ইয়াসীন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ।]

سورة سبأ (সূরা সাবা)

৬০. প্রশ্ন: সূরা সাবা-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ سَبَإٍ)

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের ৩৪তম সূরা হলো 'সূরা সাবা'। এটি মাক্কী সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং এর আয়াত সংখ্যা ৫৪। নামকরণের ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদে সাধারণত সূরার কেন্দ্রীয় ঘটনা, বিশেষ কোনো শব্দ বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সূরা সাবাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই সূরায় 'সাবা' জাতির ঐতিহাসিক ঘটনা ও তাদের পরিণতির বিবরণ থাকার কারণে একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

আল্লামা ড. ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) তাঁর 'আত-তাফসীরুল মুনীর' গ্রন্থে এই সূরার নামকরণের যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন, তা হলো:

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও জাতির উল্লেখ: এই সূরার ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'সাবা' (سَبَإٍ) জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ

অর্থ: "অবশ্যই সাবা বাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন—দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে ও একটি বামদিকে।"

'সাবা' ছিল ইয়েমেনের একটি অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী জনপদ বা গোত্র। আল্লাহ তাআলা তাদের অঢেল নিয়ামত, উর্বর ভূমি এবং সুস্বাদু ফলের বাগান দান করেছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে বিলাসিতা ও অহংকারে মত্ত হয় এবং নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

২. **কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত:** এই সূরায় পাশাপাশি দুটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে হযরত দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমত। অন্যদিকে সাবা জাতির অকৃতজ্ঞতা এবং তাদের ওপর আল্লাহর গজব বা 'সায়লুল আরিম' (বাঁধ ভাঙা বন্যা)। এই ঐতিহাসিক তুলনা ও শিক্ষার বিষয়টি এই সূরার মূল উপজীব্য হওয়ায়, অকৃতজ্ঞ জাতি 'সাবা'-এর নামানুসারে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উপসংহার:

মূলত, সাবা জাতির ঘটনা থেকে মুসলিম উম্মাহ যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরি না করে—এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে 'সূরা সাবা'।

---

৬১. প্রশ্ন: সূরা সাবা-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ। (اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ سَبَإٍ مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সাবা একটি মাক্কী সূরা। মাক্কী সূরাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং কাফেরদের বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডন করা। এই সূরায় ইসলামি আকিদার বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে সূরা সাবার প্রধান বিষয়বস্তুগুলো বিস্তারিত নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **তাওহীদ ও আল্লাহর ইলম:** সূরার শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, মাটির গভীরে যা প্রবেশ করে এবং যা বের হয়—সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের আয়ত্তে। মুশরিকরা আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান নিয়ে যে সন্দেহ পোষণ করত, তা এখানে খণ্ডন করা হয়েছে।

২. কিয়ামত ও পুনরুত্থান: মক্কার কাফেররা উপহাস করে বলত, "আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না।" আল্লাহ তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শপথ করে বলেছেন:

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ

অর্থ: "বলুন, অবশ্যই আসবে! আমার রবের শপথ, তা তোমাদের কাছে আসবেই।" এই সূরায় পুনরুত্থান এবং আখেরাতের বিচার দিবসের বাস্তবতা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৩. কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞের পরিণাম: আল্লাহ তাআলা এই সূরায় দুটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন:

* হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ.): তাঁরা ছিলেন কৃতজ্ঞ বান্দা। তাই আল্লাহ তাঁদের রাজত্ব, লোহা নরম হওয়া এবং বাতাস নিয়ন্ত্রণের মতো মোজেজা দান করেছিলেন।

* সাবা জাতি: তারা ছিল অকৃতজ্ঞ। ফলে আল্লাহ তাদের সাজানো বাগান ও জনপদ বন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। এর মাধ্যমে মুমিনদের শোকরগুজার হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

৪. **নবুওয়াতের সার্বজনীনতা:** হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে কোনো নির্দিষ্ট গোত্র বা সময়ের জন্য নন, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন (আয়াত ২৮), তা এই সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে।

৫. **শয়তানের প্রভাব ও মানুষের দুর্বলতা:** ইবলিস মানুষকে পথভ্রষ্ট করার যে শপথ নিয়েছিল, অধিকাংশ মানুষ তার অনুসরণ করে তা সত্য প্রমাণ করেছে। তবে মুমিনদের ওপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই—এই বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার:

সংক্ষেপে, সূরা সাবা মানুষের ঈমানকে শাণিত করে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর অনুগত বান্দা হওয়ার আহ্বান জানায়।

---

৬২. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী " ... افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم الاية"-এর মর্মার্থ কী?

(مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم... الْآيَةَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত এবং পরকাল নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করত এবং অহংকারবশে সত্যকে অস্বীকার করত। আল্লাহ তাআলা তাদের এই

হঠকারিতা ও নির্বুদ্ধিতার জবাব দিতে গিয়ে সূরা সাবার ৯ নং আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আয়াতের মর্মার্থ (مُرَادُ الْآيَةِ):

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: "তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের সামনের ও পেছনের আকাশ ও পৃথিবীর দিকে?" [2]

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ হলো:

১. আল্লাহর ক্ষমতার বেষ্টনী:

মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, সে আল্লাহর রাজত্বের ভেতরেই আছে। তার মাথার ওপরে আকাশ এবং পায়ের নিচে জমিন। সামনে ও পেছনে দিগন্তবিস্তৃত আল্লাহর সৃষ্টি। অর্থাৎ, মানুষ চতুর্দিক থেকে আল্লাহর কুদরতের করায়ত্ত। সে আল্লাহর রাজত্ব থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে না।

২. শাস্তির ভয় প্রদর্শন (التَّهْدِيدُ بِالْعَذَابِ):

আল্লাহ তাআলা সতর্ক করছেন যে, যারা অহংকার করছে, তারা যেন নিরাপদ মনে না করে। আল্লাহ চাইলে মুহূর্তের মধ্যে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। আয়াতে দুটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

- **খাসফ (الْخَسْفُ):** আল্লাহ বলেন, إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ অর্থাৎ "আমি চাইলে তাদেরকেসহ ভূমি ধসিয়ে দিতে পারি।" যেমনটি তিনি কারূনের ক্ষেত্রে করেছিলেন।
- **কিসফ (الْكِسْفُ):** অথবা نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ "আকাশ থেকে কোনো খণ্ড বা টুকরো তাদের ওপর পতিত করতে পারি।" যেমনটি হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওমের ওপর 'মেঘের ছায়া থেকে আগুন' বর্ষণের মাধ্যমে করা হয়েছিল।

৩. নিদর্শন ও শিক্ষা:

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ। অর্থাৎ, এই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মাঝে সেই বান্দার জন্য নিদর্শন রয়েছে, যে আল্লাহর দিকে রুজু করে বা তওবা করে। অহংকারী ব্যক্তিরা অন্ধ, কিন্তু বিনয়ী বান্দারা এর মাধ্যমে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে।

উপসংহার:

মূলত, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তাই অহংকার ছেড়ে তাদের উচিত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা।

---

৬৩. প্রশ্ন: দাউদ (আ)-কে কী মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল? (مَا هُوَ الْفَضْلُ الَّذِي أُوتِيَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী হযরত দাউদ (আ.)-কে নবুওয়তের পাশাপাশি এমন কিছু বিশেষ মর্যাদা ও মোজেজা দান করেছিলেন, যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। সূরা সাবার ১০ নং আয়াতে একে 'ফজল' (অনুগ্রহ) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রদত্ত মর্যাদা ও নিয়ামতসমূহ (الْفَضْلُ وَالنِّعَمُ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে হযরত দাউদ (আ.)-কে প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদাগুলো হলো:

১. পাহাড় ও পাখির তাসবিহ পাঠ: আল্লাহ তাআলা পাহাড় এবং পাখিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন দাউদ (আ.)-এর অনুগত হতে। তিনি যখন তাঁর সুমধুর কণ্ঠে 'জাবুর' কিতাব তিলাওয়াত করতেন বা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করতেন, তখন পাহাড় ও পাখিরাও তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে তাসবিহ পাঠ করত।

يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ

অর্থ: "হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে বারবার তাসবিহ পাঠ কর এবং হে পক্ষীকুল! তোমরাও।"

২. **লোহা নরম হওয়া:** এটি ছিল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোজেজা। আল্লাহ তাঁর হাতের স্পর্শে কঠিন লোহাকে মোম বা আটার খামিরের মতো নরম করে দিয়েছিলেন। লোহাকে বাঁকানোর জন্য তাঁর কোনো হাতুড়ি বা আগুনের চুল্লির প্রয়োজন হতো না।

৩. **নবুওয়ত ও রাজত্বের সমন্বয়:** আল্লাহ তাঁকে একই সাথে নবুওয়ত এবং বিশাল রাজত্ব দান করেছিলেন, যা বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে এক বিরল সম্মান।

৪. **হিকমত ও ফয়সালাকারী প্রজ্ঞা:** তাঁকে জটিল বিষয় মীমাংসা করার মতো অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছিল।

উপসংহার:

মূলত এই মর্যাদাগুলো ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান, যার শুকরিয়া হিসেবে দাউদ (আ.) ও তাঁর পরিবার সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

---

৬৪. প্রশ্ন: কোন নবীর জন্য লোহাকে নরম করে দেওয়া হয়েছিল? (لِأَيِّ نَبِيٍّ أُلِينَ الْحَدِيدُ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহ তাআলা নবীদের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন জড়বস্তুকে তাদের অনুগত করে দিয়েছিলেন। লোহা নরম হওয়ার ঘটনাটি কুরআনের এক বিস্ময়কর মোজেজা।

নবীর নাম ও বিবরণ:

পবিত্র কুরআনের সূরা সাবার ১০ নং আয়াত অনুযায়ী, মহান আল্লাহ হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন:

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

অর্থ: "এবং আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি।"

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা:

১. অলৌকিকত্ব: সাধারণত লোহা গলাতে বা নরম করতে প্রচণ্ড উত্তাপ ও আগুনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) যখন লোহা হাতে নিতেন, তখন আল্লাহর কুদরতে তা মোমের মতো নরম হয়ে যেত।

২. ব্যবহার: এই নরম লোহা দিয়ে তিনি কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াই হাত দিয়ে যুদ্ধের বর্ম (Zirah) তৈরি করতেন। এগুলো ছিল 'সাবিখাত' বা পূর্ণাঙ্গ বর্ম, যা দেহকে আবৃত রাখত এবং যোদ্ধাদের সুরক্ষা দিত।

৩. হালাল জীবিকা: তিনি ছিলেন একজন বাদশাহ, তবুও তিনি রাজকোষ থেকে অর্থ না নিয়ে নিজের হাতের তৈরি বর্ম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

উপসংহার:

লোহা নরম হওয়ার এই মোজেজাটি হযরত দাউদ (আ.)-এর নবুওয়তের এক অকাট্য দলিল।

---

৬৫. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "وما ارسلناك الا كافة للناس ... الاية"-এর মর্মার্থ কী?

(مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ... الْآيَةَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম যে কোনো আঞ্চলিক ধর্ম নয় এবং মহানবী (সা.) যে কেবল আরবদের নবী নন—এই চিরন্তন সত্যটি সূরা সাবার ২৮ নং আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতের মর্মার্থ (مَعْنَى الْآيَةِ):

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

অর্থ: "আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য:

১. রিসালাতের বিশ্বজনীনতা (عُمُومُ الرِّسَالَةِ): 'কাফফাতান লিন্নাস' (كَافَّةً لِّلنَّاسِ) শব্দগুচ্ছ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত কাল, স্থান বা পাত্রের সীমানায় আবদ্ধ নয়। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত পৃথিবীর সকল মানুষ—চাই সে আরব হোক বা অনারব, সাদা হোক বা কালো—সবার জন্য নবী। পূর্ববর্তী নবীরা নির্দিষ্ট গোত্র বা সময়ের জন্য আসতেন, কিন্তু মহানবী (সা.) এসেছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য।

২. **সুসংবাদ ও সতর্কবাণী:** তিনি মুমিন ও নেককারদের জান্নাতের সুসংবাদ দেন (বশীর) এবং কাফের ও পাপাচারীদের জাহান্নামের ভয় দেখান (নাজির)।

৩. **শ্রেষ্ঠত্ব:** এটি মহানবী (সা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য (খাসাইস), যা তাঁকে অন্য সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

উপসংহার:

এই আয়াতের মর্ম হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনীত দ্বীন ও শরীয়ত সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় জীবনব্যবস্থা।

---

৬৬. প্রশ্ন: সূরা সাবা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ। (اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ سَبَإٍ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা সাবা ইতিহাস, আকিদা ও নৈতিকতার এক অনন্য ভাণ্ডার। এই সূরা থেকে আমরা ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি।

প্রাপ্ত শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. **কৃতজ্ঞতার পুরস্কার ও অকৃতজ্ঞতার শাস্তি:** হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ.)-এর ঘটনা শেখায় যে, ক্ষমতা ও সম্পদ পেয়ে শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ তা বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে, সাবা জাতির ঘটনা শেখায় যে, নিয়ামতের নাশোকরি করলে আল্লাহ তা ছিনিয়ে নেন এবং গজব নাজিল করেন।

২. **রিজিকের মালিক আল্লাহ:** মানুষের রিজিক কম বা বেশি হওয়া আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকুচিত করেন। তাই রিজিকের জন্য হালাল পথে চেষ্টা করে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে।

৩. **নিজ হাতে উপার্জনের মর্যাদা:** হযরত দাউদ (আ.) নবী ও বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে বর্ম তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এটি শ্রমের মর্যাদার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৪. **শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্কতা:** ইবলিস মানুষকে পথভ্রষ্ট করার যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, অধিকাংশ মানুষ তার অনুসরণ করে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মুমিনকে সর্বদা শয়তানের ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

৫. **আখেরাতের জবাবদিহিতা:** দুনিয়ার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না, যদি না সাথে ঈমান ও নেক আমল থাকে। কিয়ামতের দিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।

৬. **নবুওয়তের সর্বজনীনতা:** হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বনবী। তাই তাঁর আদর্শ ও সুন্নাহ মেনে চলাই মুক্তির একমাত্র পথ।

উপসংহার:

সূরা সাবার এই শিক্ষাগুলো আমাদের ঈমানকে মজবুত করে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

سورة فاطر (সূরা ফাতির)

৬৭. প্রশ্ন: সূরা ফাতির-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ فَاطِرٍ)

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের ৩৫তম সূরা হলো 'সূরা ফাতির'। এটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং এর আয়াত সংখ্যা ৪৫। আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণবাচক নাম ও ফেরেশতাদের আলোচনার কারণে এই সূরাটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

১. 'ফাতির' শব্দের উল্লেখ: এই সূরার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা নিজেকে 'ফাতির' (فَاطِرِ) হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা (ফাতির)।" 'ফাতির' শব্দের অর্থ হলো—যিনি কোনো পূর্বনমুনা ছাড়াই নতুনভাবে সৃষ্টি করেন (The Originator/Creator)। যেহেতু এই সূরার শুরুতে আল্লাহর এই মহান গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আসমান-জমিন সৃষ্টির নিপুণতা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'সূরা ফাতির'।

২. **ফেরেশতাদের আলোচনা:** এই সূরার প্রথম আয়াতে ফেরেশতাদের ডানার বর্ণনা এবং তাদের আল্লাহ কর্তৃক রসূল বা বার্তাবাহক হিসেবে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এজন্য কোনো কোনো মুফাসসির (যেমন ইমাম তিরমিযী) একে **'সূরা আল-মালালাইকাহ' (سُورَةُ الْمَلَائِكَةِ)** বা 'ফেরেশতাদের সূরা' বলেও অভিহিত করেছেন।

উপসংহার:

মূলত আসমান ও জমিনের আদি স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরার কারণেই এই সূরার নাম 'ফাতির' রাখা হয়েছে।

৬৮. প্রশ্ন: সূরা ফাতির-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
(اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ فَاطِرٍ مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ফাতির একটি মাক্কী সূরা। তাই এতে প্রধানত তাওহীদের প্রমাণ, শিরকের অসারতা এবং মক্কার কাফেরদের সতর্ক করার বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে এর প্রধান বিষয়বস্তুগুলো হলো:

১. আল্লাহর কুদরত ও তাওহীদ: আসমান-জমিন সৃষ্টি, ফেরেশতাদের ডানার বৈচিত্র্য, বায়ু প্রবাহ, মৃত পৃথিবীকে জীবিত করা এবং পানি থেকে মণি-মুক্তা আহরণ—এসবের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে।

২. রিসালাত ও সত্যের জয়: নবী (সা.)-এর সান্ত্বনা এবং কাফেরদের ষড়যন্ত্র যে ব্যর্থ হবে, তার ঘোষণা। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝাতে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, আলো ও অন্ধকারের উপমা পেশ করা হয়েছে।

৩. মানুষের অসহায়ত্ব: আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ

অর্থ: "হে মানুষ! তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।"

৪. পাপের দায়ভার: কিয়ামতের দিন কেউ অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)—এই চিরন্তন নীতি ঘোষিত হয়েছে।

৫. পবিত্র কুরআন: আল-কুরআনকে সত্য গ্রন্থ এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যয়নকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার:

এই সূরার মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের দিকে আহ্বান জানানো।

৬৯. প্রশ্ন: মহান আল্লাহর বাণী "افمن زين له سوء عمله فراه حسنا" শানে নুযুল বর্ণনা কর।
("بَيِّنْ سَبَبَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى "أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا")

উত্তর:

ভূমিকা:

শয়তান মানুষের মন্দ কাজগুলোকে চাকচিক্যময় করে তোলে, যাতে মানুষ পাপকে পুণ্য মনে করে গর্ববোধ করে। সূরা ফাতিরের ৮ নং আয়াতটি এই প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযুল (سَبَبُ النُّزُولِ):
মুফাসসিরগণের মতে, এই আয়াতটি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা একটি দলের আচরণের প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি মত রয়েছে:

১. আবু জাহেল ও মক্কার কাফেররা: অধিকাংশ মুফাসসির, যেমন—ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতটি মক্কার কুখ্যাত কাফের নেতা আবু জাহেল বা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা কাবা ঘরে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত, শিরক করত এবং নবীজির বিরোধিতা করত। শয়তান তাদের এই জঘন্য কাজগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে 'ইবাদত' ও 'উত্তম কাজ' হিসেবে শোভিত করে তুলেছিল। তারা মনে করত তারা সঠিক পথেই আছে।

২. ভ্রান্ত মতবাদীরা: কাতাদা (রহ.) বলেন, এটি পরবর্তী যুগের খারেজি বা বিদ'আতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি করে এবং নিজেদের সঠিক মনে করে।

৩. সাধারণ কাফের: কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, এটি সাধারণভাবে সকল কাফেরের জন্য নাজিল হয়েছে, যারা নিজেদের ভ্রষ্টতাকে হেদায়েত মনে করে।

আয়াতের অর্থ: "যাকে তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয়েছে, ফলে সে তাকে উত্তম মনে করে, (সে কি তার সমান যে সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে?)"

উপসংহার:
মূলত আবু জাহেল ও তার অনুসারীদের আত্মপ্রবঞ্চনা ও হঠকারিতা তুলে ধরতেই এই আয়াত নাজিল হয়।

৭০. প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার বাণী "وما يعمر من معمر ولا ينقص" -এর মর্মার্থ কী?

(مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى "وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ... الْآيَةَ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের হায়াত, মউত এবং রিজিক—সবকিছুই আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত লিখন বা তাকদির অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সূরা ফাতিরের ১১ নং আয়াতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

আয়াতের মর্মার্থ (مَعْنَى الْآيَةِ):

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

অর্থ: "কোনো বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ে না এবং তার বয়স কমানোও হয় না, কিন্তু তা কিতাবে (লওহে মাহফুজে) রয়েছে।"

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা:

এই আয়াতের 'বয়স কমানো বা বাড়ানো' নিয়ে মুফাসসিরগণের দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. ব্যক্তিগত বয়স (লওহে মাহফুজ): এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা লওহে মাহফুজে বা মানুষের তাকদিরে যা লিখে রেখেছেন, সে অনুযায়ীই তার বয়স বাড়ে বা পূর্ণতা পায়। কারো বয়স যদি ৬০ বছর লেখা থাকে, তবে সে ৬০ বছরই পাবে, তা থেকে এক মুহূর্তও কমবে না বা বাড়বে না। এখানে 'কমানো' বা 'বাড়ানো' বলতে—কারো বয়স বেশি (যেমন ১০০ বছর) এবং কারো বয়স কম (যেমন ২০ বছর) হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, একজনের সাপেক্ষে অন্যের বয়স কম-বেশি হয়, যা সবই আল্লাহর কিতাবে লিখিত।

২. ফেরেশতাদের কিতাব: অন্য মতে, ফেরেশতাদের কাছে যে আমলনামা বা লাইফ চার্ট থাকে, নেক আমল বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কারণে তাতে বরকত হিসেবে বয়স বাড়ানো হতে পারে (হাদিস অনুযায়ী), আর পাপের কারণে তা কমতে পারে। তবে মূল কিতাবে (লওহে মাহফুজ) তা অপরিবর্তিত থাকে।

সহজ কথা: দুনিয়াতে কেউ দীর্ঘজীবী হয় আবার কেউ অল্প বয়সে মারা যায়— এই সব কিছুই আল্লাহর পূর্বপরিকল্পনা ও 'কিতাব' বা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে।

উপসংহার:

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু এবং আয়ুষ্কাল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণের অধীন।

---

৭১. প্রশ্ন: মহান আল্লাহর বাণী "وما يستوى البحران هذا عذب فرات" -এর মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি বর্ণনা কর।
بَيِّنِ الْآيَاتِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ")

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ফাতিরের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম কুদরতের নিদর্শন হিসেবে পানির ভিন্নতা এবং তার উপযোগিতার কথা তুলে ধরেছেন। এটি তাওহীদের এক অকাট্য দলিল।

আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি (آيَاتُ الْقُدْرَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনগুলো হলো:

১. পানির স্বাদে ভিন্নতা: আল্লাহ তাআলা পাশাপাশি দুটি সাগর সৃষ্টি করেছেন। একটির পানি সুপেয় ও তৃষ্ণা নিবারক (عَذْبٌ فُرَاتٌ - সুমিষ্ট ও পানযোগ্য), যা নদী বা ঝর্ণার পানি। অন্যটির পানি লোনা ও বিস্বাদ (مِلْحٌ أُجَاجٌ - অত্যন্ত লবণাক্ত ও তেতো), যা সমুদ্রের পানি। কোনো প্রাচীর ছাড়াই এই দুই ধরণের পানির সহাবস্থান আল্লাহর এক বিশাল কুদরত।

২. উভয় পানি থেকে খাদ্যের যোগান: যদিও স্বাদে ভিন্ন, তবুও উভয় প্রকার পানি থেকেই মানুষ তাজা মাছ বা গোশত (لَحْمًا طَرِيًّا) আহরণ করে। লোনা ও মিঠা উভয় পানিতেই মাছের বেঁচে থাকা আল্লাহর রহমত।

৩. অলঙ্কার আহরণ: সমুদ্রের লোনা পানি থেকে মানুষ মুক্তা ও প্রবাল (حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا) সংগ্রহ করে, যা অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. চলাচলের মাধ্যম: এই বিশাল জলরাশির বুক চিরে মানুষ জাহাজ ও নৌকা চালায় (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ), যা অর্থনীতির চাকা সচল রাখে।

উপসংহার:

স্বাদ ও গুণের ভিন্নতা সত্ত্বেও উভয় পানিই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত—এটাই আল্লাহর মহান কুদরত।

---

৭২. প্রশ্ন: মহান আল্লাহর বাণী "ولا تزر وازرة وزر اخرى" -এর ব্যাখ্যা কর।
("اِشْرَحْ قَوْلَهُ تَعَالَى "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى")

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি হলো ‘ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা’। সূরা ফাতিরের ১৮ নং আয়াতে আখেরাতের বিচারের এই ন্যায়পরায়ণ নীতিটি ঘোষিত হয়েছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تَفْسِيرُ الْآيَةِ):

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

অর্থ: “কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।”

তাৎপর্য:

১. পাপের দায়ভার: কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। কেউ অন্য কারো পাপের বোঝা নিজের কাঁধে নেবে না। পিতা পুত্রের পাপের জন্য বা পুত্র পিতার পাপের জন্য দায়ী হবে না।

২. ন্যায়বিচার (الْعَدْلُ): দুনিয়াতে হয়তো একজনের অপরাধে অন্যকে জড়ানো হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর আদালতে তা অসম্ভব। সেখানে কেবল অপরাধীকেই শাস্তি দেওয়া হবে।

৩. সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান: আয়াতে আরও বলা হয়েছে, যদি কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি কাউকে তার পাপের বোঝা নিতে ডাকে, তবে আত্মীয়-স্বজনও তা গ্রহণ করবে না (وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ)। প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে (ইয়া নাফসি! ইয়া নাফসি!)।

উপসংহার:

এই আয়াতের শিক্ষা হলো, পরকালের মুক্তির জন্য নিজেকেই আমল করতে হবে, অন্যের ওপর ভরসা করা বোকামি।

---

৭৩. প্রশ্ন: মহান আল্লাহর বাণী "انما يخشى الله من عباده العلماء" -এর ব্যাখ্যা কর।
(أَوْضِحْ قَوْلَهُ تَعَالَى "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ")

উত্তর:

ভূমিকা:

জ্ঞান ও ভীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যার জ্ঞান যত গভীর, আল্লাহর প্রতি তার ভয় তত বেশি। সূরা ফাতিরের ২৮ নং আয়াতে আলেম বা জ্ঞানীদের এই বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تَفْسِيرُ الْآيَةِ):

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ: "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই (আলেমরাই) তাঁকে ভয় করে।"

তাৎপর্য:

১. আলেম কারা: তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যায়, এখানে 'উলামা' বলতে কেবল কিতাবি বিদ্যা অর্জনকারী নয়, বরং যারা আল্লাহর কুদরত, সিফাত এবং মহত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

২. ভয়ের কারণ: যে ব্যক্তি কোনো প্রতাপশালী সত্তার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে, সে তাকে ভয় পায়। জ্ঞানীরা যেহেতু আসমান, জমিন এবং সৃষ্টির রহস্য নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, তাই তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় (খাশিয়াত) অন্যদের চেয়ে বেশি থাকে।

৩. ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত: তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জাত, সিফাত ও ক্ষমতার মারেফাত (পরিচয়) লাভ করেছে, সেই প্রকৃত আলেম এবং সেই তাঁকে ভয় করে।" মূর্খ ব্যক্তি আল্লাহর আজমত বা বড়ত্ব বোঝে না, তাই সে বেপরোয়া হয়।

উপসংহার:

প্রকৃত ইলম বা জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর অনুগত ও বিনয়ী করে। যে ইলম আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না, তা প্রকৃত ইলম নয়।

---

৭৪. প্রশ্ন: সূরা ফাতির থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ। (اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ فَاطِرٍ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ফাতির তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের এক অপূর্ব সমাহার। এটি আমাদের ঈমানি চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য বহু শিক্ষা প্রদান করে।

প্রাপ্ত শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. আল্লাহর কুদরত: আকাশ, বাতাস, সমুদ্র ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য—সবই আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ। এসব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা মুমিনের দায়িত্ব।

২. রিজিকের উৎস: লোনা ও মিঠা পানি—উভয়টি থেকেই আল্লাহ আমাদের রিজিক (মাছ ও অলঙ্কার) দান করেন। সব অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত বিরাজমান।

৩. ব্যক্তিগত দায়িত্ব: পরকালে কেউ কারো পাপের বোঝা নেবে না। এমনকি মা-বাবাও সন্তানের পাপের ভাগ নেবে না। তাই নিজেকেই আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

৪. জ্ঞানের মর্যাদা: আল্লাহর পরিচয় লাভকারী আলেমরাই আল্লাহর প্রকৃত ভীরু বান্দা। ইলম অর্জনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাকওয়া অর্জন।

৫. শয়তানের শত্রুতা: শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে মন্দ কাজকে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করে। শয়তানের প্ররোচনা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

৬. সম্মান কেবল আল্লাহর কাছে: কেউ যদি সম্মান (ইজ্জত) চায়, তবে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে। কারণ, সমস্ত সম্মান ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ (فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا)।

উপসংহার:

সূরা ফাতির আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর সৃষ্টির বিশালতা দেখে তাঁর প্রতি বিনয়ী হতে হবে এবং পরকালের ভয়াবহতা স্মরণ করে পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে।

سورة يس (সূরা ইয়াসীন)

৭৫. প্রশ্ন: সূরা ইয়াসীনের নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।
(اُذْكُرْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِسُورَةِ يس)

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের ৩৬তম সূরা হলো 'সূরা ইয়াসীন'। এটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং কুরআনের অন্যতম ফজিলতপূর্ণ সূরা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সূরাকে 'কুরআনের হৃৎপিণ্ড' (Qalb al-Quran) বা প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন।

নামকরণের কারণ (وَجْهُ التَّسْمِيَةِ):

১. হুরুফে মুকাত্তা'আতের ব্যবহার: এই সূরার প্রথম আয়াতটি হলো 'ইয়াসীন' (يس)। এটি 'হুরুফে মুকাত্তা'আত' বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সূরাটি এই মোবারক শব্দটি দিয়ে শুরু হয়েছে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা ইয়াসীন'।

২. রাসূল (সা.)-এর নাম: অনেক মুফাসসিরের মতে, 'ইয়াসীন' হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম একটি নাম। আল্লাহ তাআলা এই নামে তাঁর হাবীবকে সম্বোধন করে কসম খেয়েছেন। এই সম্মানের কারণেও এই নাম বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

অন্যান্য নাম:

হাদিস শরীফে এই সূরাকে 'ক্বালবুল কুরআন' (قَلْبُ الْقُرْآنِ) বা 'কুরআনের হৃদয়' বলা হয়েছে। এছাড়াও তাফসিরের কিতাবে একে 'আল-মু'আম্মাহ' (الْمُعَمَّةُ) বা 'ব্যাপক কল্যাণকারী' এবং 'আল-কাদিয়া' (الْقَاضِيَةُ) বা 'প্রয়োজন পূরণকারী' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার:

সূরার প্রারম্ভিক শব্দের স্বকীয়তা এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি সম্মানের নির্দশনস্বরূপ এই সূরার নাম রাখা হয়েছে 'ইয়াসীন'।

৭৬. প্রশ্ন: সূরা ইয়াসীনের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
(اُكْتُبْ مَوْضُوعَاتِ سُورَةِ يس مُخْتَصَرًا)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ইয়াসীন মাক্কী সূরা হওয়ায় এতে ইসলামের বুনিয়াদ বা মৌলিক আকিদাগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় আলোচিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু (مَوْضُوعَاتُ السُّورَةِ):

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে সূরা ইয়াসীনের প্রধান তিনটি আলোচ্য বিষয় হলো:

১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ): মৃত পৃথিবীকে জীবিত করা, রাত-দিনের আবর্তন, সূর্য ও চন্দ্রের সুশৃঙ্খল কক্ষপথ এবং সাগরে চলমান নৌযান—এসব প্রাকৃতিক নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ও কুদরত প্রমাণ করা হয়েছে।

২. রিসালাত (নবুওয়ত): সূরার শুরুতে কুরআন ও নবুওয়তের সত্যতার শপথ করা হয়েছে। এরপর 'আসহাবুল কারইয়াহ' বা জনপদবাসীদের কাছে প্রেরিত তিন জন রাসূলের ঘটনা এবং হাবিব নাজ্জারের ঈমানী দীপ্তির কাহিনী বর্ণনা করে রিসালাতের সত্যতা তুলে ধরা হয়েছে।

৩. আখেরাত (পরকাল ও পুনরুত্থান): কাফেররা পচা হাড় দেখিয়ে পুনরুত্থান অস্বীকার করত। আল্লাহ যুক্তি দিয়ে বলেছেন, "যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।" জান্নাতবাসীদের সুখ-শান্তি এবং জাহান্নামীদের লাঞ্ছনার চিত্রও এখানে ফুটে উঠেছে।

উপসংহার:

সূরা ইয়াসীন মূলত ঈমানের এই তিন মূলস্তম্ভকে (তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত) মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল করার জন্যই নাজিল হয়েছে।

৭৭. প্রশ্ন: يس শব্দের অর্থ কী? কারও নাম يس রাখা বৈধ কি না? (مَا مَعْنَى لَفْظِ "يس"؟ هَلْ يَجُوزُ تَسْمِيَةُ أَحَدٍ بِـ "يس"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

'ইয়াসীন' (يس) শব্দটি পবিত্র কুরআনের রহস্যময় শব্দগুলোর একটি। এর সঠিক অর্থ আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

'ইয়াসীন' শব্দের অর্থ (مَعْنَى لَفْظِ يس):

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত: তিনি বলেন, 'ইয়াসীন' অর্থ হলো "হে মানুষ" (يَا إِنْسَانُ)। তাইয় গোত্রের ভাষায় বা হাবশি (ইথিওপিয়ান) ভাষায় এর অর্থ 'হে মানুষ' বা 'হে পুরুষ'।

২. মুজাহিদ (রহ.)-এর মত: এটি আল্লাহর আসমাউল হুসনা বা নামসমূহের একটি।

৩. জনপ্রিয় মত: অধিকাংশ আলেম ও মুফাসসিরের মতে, এখানে 'হে মানুষ' বা 'কামিল মানুষ' বলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (নিশ্চয়ই আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত) দ্বারা এই মতটিই প্রবল হয়। অর্থাৎ, "হে নেতা!" বা "হে মানবকুলের সর্দার!"

কারও নাম 'ইয়াসীন' রাখার হুকুম:

- **বৈধতা:** কারও নাম 'ইয়াসীন' রাখা **বৈধ এবং মুস্তাহাব**। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি নাম হিসেবে বরকতময়। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, "আমার কাছে পছন্দনীয় হলো নবীগণের নামে নাম রাখা।" যেহেতু ইয়াসীন নবীর একটি নাম, তাই এই নাম রাখা উত্তম।

- **ভুল ধারণা:** কেউ কেউ মনে করেন হুরুফে মুকাত্তা'আত (যেমন- ত্বহা, ইয়াসীন) দিয়ে নাম রাখা মাকরূহ, কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো—যদি এটি রাসূল (সা.)-এর নাম হিসেবে রাখা হয়, তবে তা প্রশংসনীয়। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই নামের ব্যাপক প্রচলন এর বৈধতার প্রমাণ।

উপসংহার:

'ইয়াসীন' অর্থ 'হে মানব' বা 'হে নবী' এবং সন্তান বা ব্যক্তির নাম হিসেবে 'ইয়াসীন' রাখা সম্পূর্ণ জায়েজ ও বরকতময়।

---

৭৮. প্রশ্ন: সূরা ইয়াসীনের ফযিলত বর্ণনা কর। (بَيِّنْ فَضِيلَةَ سُورَةِ يس)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ইয়াসীন কুরআনের এমন একটি সূরা, যার ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এটি ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের চাবিকাঠি।

সূরা ইয়াসীনের ফযিলত (فَضَائِلُ السُّورَةِ):

১. কুরআনের হৃৎপিণ্ড: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس

অর্থ: "নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃৎপিণ্ড আছে, আর কুরআনের হৃৎপিণ্ড হলো সূরা ইয়াসীন।" (তিরমিযী)

এই সূরা পাঠ করলে ১০ বার পূর্ণ কুরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায় বলে কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে।

২. গুনাহ মাফ: হাদিস শরীফে এসেছে:

مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (ইবনে হিব্বান ও বায়হাকি)

৩. মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য পাঠ: মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে এই সূরা পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন:

اقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ

অর্থ: "তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রী বা মৃতদের কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।" (আবু দাউদ)। এটি পাঠ করলে মৃত্যুর কষ্ট লাঘব হয় এবং আল্লাহর রহমত নাজিল হয়।

৪. **প্রয়োজন পূরণ:** সকালে এই সূরা পাঠ করলে সারাদিনের প্রয়োজন আল্লাহ পূরণ করে দেন এবং সব কাজে বরকত দান করেন।

উপসংহার:

সূরা ইয়াসীন দুনিয়ার হাজত পূরণ এবং আখেরাতের নাজাতের এক মহা বাতিঘর। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত এই সূরাটি মুখস্থ রাখা বা নিয়মিত তিলাওয়াত করা।

---

৭৯. প্রশ্ন: কোন সূরাকে আল কুরআনের হৃদয় বলা হয়? (أَيُّ سُورَةٍ سُمِّيَتْ بِقَلْبِ الْقُرْآنِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

মানবদেহে হৃৎপিণ্ড বা কলব (Heart) যেমন প্রাণসঞ্চার ও রক্তপ্রবাহের মূল কেন্দ্র, তেমনি পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার মধ্যে একটি বিশেষ সূরা রয়েছে, যাকে কুরআনের প্রাণকেন্দ্র বা 'ক্বালবুল কুরআন' বলা হয়।

কুরআনের হৃদয় (قَلْبُ الْقُرْآنِ):

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র হাদিস অনুযায়ী 'সূরা ইয়াসীন'-কে কুরআনের হৃদয় বলা হয়।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس

অর্থ: "নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃৎপিণ্ড বা সারবস্তু আছে, আর কুরআনের হৃৎপিণ্ড হলো সূরা ইয়াসীন।" (সুনানে তিরমিযী: ২৮৮৭)

হৃদয় বলার কারণ:

তাফসীরুল মুনীর-এ আল্লামা ওহবা আয-যুহাইলী (রহ.) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

১. আকিদার সারসংক্ষেপ: কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় তিনটি—তাওহীদ (একত্ববাদ), রিসালাত (নবুওয়ত) এবং আখেরাত (পরকাল)। সূরা ইয়াসীনে এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত জোরালো ও অলঙ্কারপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ড ছাড়া যেমন দেহ অচল, তেমনি এই তিন আকিদা ছাড়া ঈমান অচল।

২. অলৌকিক প্রমাণ: এই সূরায় আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও কুদরতের অকাট্য দলিল (যেমন—মৃত জমি জীবিত করা, সূর্য-চন্দ্রের আবর্তন) পেশ করা হয়েছে, যা ঈমানের শিরা-উপশিরায় প্রাণসঞ্চার করে।

৩. পরকালীন ভীতি ও আশা: জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র এমনভাবে আঁকা হয়েছে, যা মানুষের মৃত অন্তরকে জীবিত করে তোলে।

উপসংহার:

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং ঈমানি চেতনার গভীরতার কারণে সূরা ইয়াসীনকে কুরআনের হৃদয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

---

৮০. প্রশ্ন: সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত "صراط مستقيم" দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (مَا الْمُرَادُ بِـ "صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" فِي "سُورَةِ يس"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

'সিরাতাল মুস্তাকিম' বা সরল সঠিক পথ—এই পরিভাষাটি কুরআনে বহুবার এসেছে। সূরা ইয়াসীনের ৬১ নং আয়াতে শয়তানের পূজা না করে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে একেই 'সিরাতুম মুস্তাকিম' বলা হয়েছে।

সিরাতাল মুস্তাকিম-এর উদ্দেশ্য (الْمُرَادُ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ):

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

অর্থ: "এবং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর। এটাই সরল সঠিক পথ।"

তাফসীরুল মুনীর-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১. তাওহীদ ও ইবাদত: আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তাঁরই গোলামি করা। শয়তানের প্ররোচনা বা নফসের পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর আনুগত্য করাই হলো সিরাতাল মুস্তাকিম।

২. শয়তানের বিরোধিতা: পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ (হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করো না?)। অর্থাৎ, শয়তানের দেখানো বক্রপথ পরিহার করে সুন্নাহ ও শরিয়তের পথে চলাই হলো সঠিক পথ।

৩. জান্নাতের পথ: আব্বাস (রা.)-এর মতে, যে পথ মানুষকে নিরাপদে ও সহজে জান্নাতে পৌঁছে দেয়, তা-ই সিরাতাল মুস্তাকিম। আর তা হলো ইসলাম।

উপসংহার:

সংক্ষেপে, সূরা ইয়াসীনে 'সিরাতাল মুস্তাকিম' বলতে শিরক ও কুফর মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদি জীবনব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

---

৮১. প্রশ্ন: "الرحمن الرحيم"-এর তাহকীক বা বিশ্লেষণ কর। ("حَقِّقْ "الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ")

উত্তর:

ভূমিকা:

'আর-রহমান' ও 'আর-রহীম' মহান আল্লাহর দুটি গুণবাচক নাম (সিফাতি নাম), যা তাঁর অসীম দয়া ও করুণার বহিঃপ্রকাশ। সূরা ইয়াসীনে এই গুণবাচক নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে (যেমন: আয়াত ৫ ও ৫৮)।

শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (التَّحْقِيقُ الصَّرْفِيُّ):

১. আর-রহমান (الرَّحْمَنُ):

- **সীগাহ (রূপ):** ওয়াহেদ মুজাক্কার (একবচন পুংলিঙ্গ)।

- **বহাস (প্রকার):** ইসমে মুবালাগা (আধিক্যবাচক বিশেষ্য) বা সিফাতে মুশাব্বাহ।
- **বাব (ক্রিয়ার রূপ):** 'সামিয়া-ইয়াসমাউ' (سَمِعَ-يَسْمَعُ) অথবা 'কারুমা-ইয়াক রুমু' (كَرُمَ-يَكْرُمُ) থেকে।
- **মূলধাতু (মাদ্দাহ):** র-হা-ম (ر-ح-م)।
- **অর্থ:** পরম করুণাময়, যার দয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।
- **তাফসিরি অর্থ:** যিনি দুনিয়াতে মুমিন ও কাফের সকলের প্রতি দয়াবান। এর দয়া ব্যাপক ও সর্বজনীন।

২. **আর-রহীম (الرَّحِيمُ):**

- **সীগাহ (রূপ):** ওয়াহেদ মুজাক্কার (একবচন পুংলিঙ্গ)।
- **বহাস (প্রকার):** সিফাতে মুশাব্বাহ বা ইসমে মুবালাগা।
- **ওজন (ছন্দ):** ফা'ঈলুন (فَعِيلٌ)।
- **মূলধাতু (মাদ্দাহ):** র-হা-ম (ر-ح-م)।
- **অর্থ:** অতি দয়ালু, যার দয়া চিরস্থায়ী।
- **তাফসিরি অর্থ:** যিনি পরকালে কেবল মুমিনদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করবেন।

পার্থক্য:

তাফসীরুল মুনীর-এ বলা হয়েছে, 'রহমান' নামের দয়া পরিমাণগতভাবে বেশি (Quantity), আর 'রহীম' নামের দয়া গুণগতভাবে ও স্থায়িত্বের দিক থেকে গভীর (Quality & Permanence)।

---

৮২. প্রশ্ন: "اصحاب القرية"-এর কাহিনি সংক্ষেপে লেখ।
(اُكْتُبْ قِصَّةَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ بِالِاخْتِصَارِ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ইয়াসীনের ১৩ থেকে ২৯ নং আয়াতে 'আসহাবুল কারইয়াহ' বা এক জনপদবাসীর শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এই জনপদটি ছিল ইতিহাসখ্যাত 'আন্তাকিয়া' (Antioch) নগরী।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১. রাসূল প্রেরণ: আল্লাহ তাআলা বা হযরত ঈসা (আ.) এই জনপদে প্রথমে দুজন রাসূল (বা প্রতিনিধি) পাঠান। জনপদবাসী তাঁদের মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর তাঁদের শক্তিশালী করার জন্য তৃতীয় একজন রাসূল প্রেরণ করা হয়। তাঁরা বললেন:

إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ

অর্থ: "আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।"

২. জনগণের হঠকারিতা: সীমালঙ্ঘনকারী এলাকাবাসী বলল, "তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। তোমরা মিথ্যা বলছ।" তারা রাসূলদের অশুভ লক্ষণ মনে করল এবং পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দিল।

৩. মুমিন ব্যক্তির আগমন: এ সময় নগরীর প্রান্ত থেকে হাবিব নাজ্জার (প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী) নামক এক মুমিন ব্যক্তি ছুটে এলেন। তিনি তাঁর কওমকে বললেন:

يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

অর্থ: "হে আমার জাতি! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর, যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না।"

৪. মর্মান্তিক পরিণতি: হঠকারী জাতি হাবিব নাজ্জারের কথা শোনেনি, বরং তাঁকেই শহীদ করে দিল। মৃত্যুর পরপরই তাঁকে বলা হলো, ادْخُلِ الْجَنَّةَ (জান্নাতে প্রবেশ কর)।

৫. ধ্বংসলীলা: রাসূলদের হত্যা বা অপমান করার অপরাধে আল্লাহ সেই জাতির ওপর কোনো সেনাবাহিনী পাঠাননি। বরং জিবরাঈল (আ.)-এর এক প্রচণ্ড গর্জন বা বিকট আওয়াজে (Sayhah) তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন:

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

অর্থ: "তা ছিল কেবল এক মহানাদ। ফলে তারা নিথর হয়ে গেল।"

উপসংহার:

আসহাবুল কারয়ির ঘটনা রিসালাতের সত্যতা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ভয়াবহ পরিণতির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

---

৮৩. প্রশ্ন: জনপদবাসীদের প্রতি কাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল? তাদের অবস্থান বর্ণনা কর।
(مَنْ هُمُ الْمُرْسَلُونَ إِلَى أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ؟ بَيِّنْ حَالَتَهُمْ)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ইয়াসীনের ১৪ নং আয়াতে 'আসহাবুল কারইয়াহ' বা আন্তাকিয়া বাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত রাসূলদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ তাদের পরিচয় ও সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রেরিত রাসূলদের পরিচয় (تَعْرِيفُ الْمُرْسَلِينَ):

তাফসীরুল মুনীর ও ইবনে কাসীর (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ তাআলা (বা হযরত ঈসা আ. তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে) প্রথমে দুজন রাসূল পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁদের সাহায্যকারী হিসেবে তৃতীয় আরেকজন রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁদের নাম সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত হলো:

১. প্রথম দুজন: হযরত শাম'উন (Sham'un) এবং হযরত ইউহান্না (Yuhanna)।

২. তৃতীয়জন: হযরত বাউলুস (Bulus) বা শাম'উন (ভিন্ন মতে)।

(বি.দ্র: নামগুলো ইসরাঈলি রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত, কুরআনে নাম উল্লেখ নেই)

তাদের অবস্থান ও দাওয়াত:

তারা জনপদবাসীদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল।" কিন্তু এলাকাবাসী তাঁদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং অশুভ লক্ষণ মনে করে পাথর মেরে হত্যার হুমকি দিল। তখন রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করলেন এবং বললেন, "আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।"

উপসংহার:

এই মহান দায়ীদের আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের ইতিহাস কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের পথে আহ্বানকারীদের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে।

---

৮৪. প্রশ্ন: "قالوا طائركم معكم" আয়াতের "طائركم"-এর অর্থ কী? (مَا مَعْنَى "طَائِرُكُمْ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

কাফেররা সবসময় নিজেদের বিপদ-আপদের জন্য নবীদের দায়ী করত। সূরা ইয়াসীনের ১৯ নং আয়াতে তাদের এই কুসংস্কারের জবাব দেওয়া হয়েছে।

'তায়েরুকুম' শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

১. শাব্দিক অর্থ: 'তায়ের' (طَائِرٌ) শব্দের মূল অর্থ 'পাখি'। জাহেলি যুগে আরবরা পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ণয় করত। সেখান থেকেই শব্দটি 'ভাগ্য', 'লক্ষণ' বা 'অমঙ্গল' অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। সুতরাং طَائِرُكُمْ (তায়েরুকুম) অর্থ হলো "তোমাদের অশুভ ভাগ্য" বা "কুলক্ষণ"।

২. আয়াতের মর্মার্থ: কাফেররা যখন বলল, "তোমাদের (রাসূলদের) আগমনের কারণে আমাদের অমঙ্গল হচ্ছে", তখন রাসূলগণ জবাব দিলেন: طَائِرُكُم مَّعَكُمْ।

- এর অর্থ: "তোমাদের অশুভ লক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের কারণ তো **তোমাদের সাথেই** রয়েছে।" অর্থাৎ, তোমাদের কুফরি, শিরক ও পাপাচারই তোমাদের বিপদের মূল কারণ, আমরা নই।

- *তাফসীরুল মুনীর*-এ বলা হয়েছে: "তোমাদের কর্মফল ও দুর্ভাগ্য তোমাদের ঘাড়ে চাপানো, যা তোমাদের কুফরির ফসল।"

উপসংহার:

মানুষের বিপদ তার নিজের কর্মের ফল, নবীদের আগমনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই—এটাই এই শব্দের মূল শিক্ষা।

---

৮৫. প্রশ্ন: নগরীর উপকণ্ঠ থেকে আগত ব্যক্তিটির নাম কী? (مَا اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ইয়াসীনের ২০ নং আয়াতে এক বিশেষ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যিনি শহরের শেষ প্রান্ত থেকে ছুটে এসে নিজের কওমকে রাসূলদের অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি ইতিহাসে এক সত্যপরায়ণ মুমিন হিসেবে পরিচিত।

ব্যক্তিটির নাম ও পরিচয়:

অধিকাংশ মুফাসসিরের ঐকমত্যে এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির নাম হলো হাবিব আন-নাজ্জার (حَبِيبٌ النَّجَّارُ)।

- **পেশা:** তাঁর উপাধি 'নাজ্জার' (ছুতার বা কাঠমিস্ত্রি) থেকে বোঝা যায় তিনি কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে তিনি রেশম ব্যবসায়ী ছিলেন বা রশি তৈরি করতেন।

- **চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য:** তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত দানশীল ও মুত্তাকি ব্যক্তি। তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন বলে জনবসতি থেকে দূরে শহরের এক প্রান্তে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রাসূলদের আগমনের

খবর শুনে এবং তাঁদের সত্যতা উপলব্ধি করে তিনি ঈমান আনেন এবং নিজের কওমকে হেদায়েতের পথে ডাকতে গিয়ে শহীদ হন।

উপসংহার:

হাবিব নাজ্জার সত্যের পথে অকুতোভয় আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যাকে আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

---

৮৬. প্রশ্ন: দার্শনিকগণ কীভাবে বলেন যে পৃথিবী ঘোরে, সূর্য ও চাঁদ স্থির, অথচ আল্লাহ বলেন- "والشمس تجرى لمستقرلها والقمر قدرناه منازل" ? বিশ্লেষণ কর।

(كَيْفَ قَالَتِ الْفَلَاسِفَةُ إِنَّ الْأَرْضَ تَتَحَرَّكُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سَاكِنَانِ... أَوْضِحْ)

উত্তর:

ভূমিকা:

প্রাচীন দার্শনিক এবং আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো কোনো মতবাদের সাথে কুরআনের আয়াতের আপাত বৈপরীত্য মনে হতে পারে। সূরা ইয়াসীনের ৩৮ ও ৩৯ নং আয়াতে সূর্য ও চন্দ্রের গতির কথা বলা হয়েছে, যা নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বিশ্লেষণ ও সমন্বয় (التَّحْلِيلُ وَالتَّوْفِيقُ):

১. দার্শনিক/বিজ্ঞানীদের মত: আধুনিক বিজ্ঞানের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ (Heliocentric theory) অনুযায়ী পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে স্থির। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরাও নানা মতবাদ দিয়েছিলেন।

২. কুরআনের বক্তব্য: আল্লাহ বলেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا (সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ধাবিত হয়)। এখানে 'তাজরি' (ধাবিত হয়/চলে) শব্দ দ্বারা সূর্যের গতিশীলতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৩. তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে সমাধান:

- **সূর্য স্থির নয়:** আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করেছে যে, সূর্য মোটেও স্থির নয়। সূর্য তার পুরো সৌরপরিবার নিয়ে বিশাল ছায়াপথ বা

গ্যালাক্সির (Milky Way) কেন্দ্রের চারদিকে প্রচণ্ড গতিতে (সেকেন্ডে প্রায় ২২০ কি.মি.) ঘুরছে। তার একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য বা বিশ্রামস্থল (Solar Apex) রয়েছে। কুরআনের تَجْرِي (সে চলে/ধাবিত হয়) শব্দটি এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে হুবহু মিলে যায়।

- **আপাত দৃষ্টি:** তাছাড়া পৃথিবী থেকে মানুষের দৃষ্টিতে সূর্য উদয় ও অস্ত যায়, যা দিন-রাত্রি সংঘটনের কারণ। কুরআনের ভাষা মানুষের সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং মহাজাগতিক সত্য—উভয় দিক থেকেই সঠিক।

সিদ্ধান্ত:

দার্শনিকদের 'সূর্য স্থির' থাকার মতবাদটি ছিল আপেক্ষিক বা অসম্পূর্ণ। কুরআন মাজিদ সূর্যের প্রকৃত গতিশীলতার কথাই বলেছে, যা আজকের বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত সত্য। সুতরাং কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই, বরং কুরআন বিজ্ঞানের চেয়েও অগ্রগামী।

---

৮৭. প্রশ্ন: সূর্যের বিশ্রাম পথ কোনটি এবং কোথায় অবস্থিত? সূর্য কি একই স্থানে স্থির, না পরিভ্রমণ করে?
(مَا هُوَ مُسْتَقَرُّ الشَّمْسِ وَأَيْنَ هُوَ؟ هَلِ الشَّمْسُ تَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعٍ وَتَنْقَطِعُ جَرْيُهَا أَمْ لَا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ইয়াসীনের ৩৮ নং আয়াতে সূর্যের গতির গন্তব্য সম্পর্কে 'মুস্তাকার' (مُسْتَقَرٌّ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি মহাজাগতিক এক বিস্ময়কর তথ্য।

সূর্যের মুস্তাকার বা বিশ্রামস্থল (مُسْتَقَرُّ الشَّمْسِ):

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

অর্থ: "এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ধাবিত হয়।"

তাফসীরুল মুনীর-এর আলোকে 'মুস্তাকার'-এর ব্যাখ্যায় দুটি মত প্রবল:

১. স্থানিক বা কালিক গন্তব্য: এর অর্থ হলো সূর্য কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকবে। যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন তার গতি থামবে এবং সেটাই তার চূড়ান্ত বিশ্রামস্থল বা 'মুস্তাকার'।

২. আরশের নিচে সিজদা: হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে এবং পুনরায় উদয় হওয়ার অনুমতি চায়। কিয়ামতের আগে তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। তখন তার নিয়মিত গতিপথের সমাপ্তি ঘটবে।

৩. বিজ্ঞান ও সৌর অ্যাপেক্স: আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্য 'সোলার অ্যাপেক্স' (Solar Apex) নামক একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে ধাবমান। এটিও মুফাসসিরদের ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূর্য কি স্থির না চলমান?

আয়াতে تَجْرِي (সে দৌড়ায়/চলে) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সূর্য এক স্থানে স্থির (Static) নয়, বরং সে তার নিজস্ব কক্ষপথে এবং ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে প্রচণ্ড গতিতে পরিভ্রমণ করছে। তার এই চলা বা জারি থাকা কিয়ামতের আগে থামবে না।

উপসংহার:

সূর্যের কোনো স্থায়ী বিশ্রাম নেই, বরং সে আল্লাহর নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) পর্যন্ত অবিরাম ছুটে চলছে।

---

৮৮. প্রশ্ন: চাঁদের মঞ্জিল কয়টি ও কী কী? (مَنَازِلُ الْقَمَرِ كَمْ هِيَ؟ وَمَا هِيَ؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

দিন-তারিখ ও সময় গণনার সুবিধার জন্য আল্লাহ তাআলা চাঁদের জন্য কিছু মঞ্জিল বা ঘাঁটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সূরা ইয়াসীনের ৩৯ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে।

চাঁদের মঞ্জিলসমূহ (مَنَازِلُ الْقَمَرِ):

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

অর্থ: "এবং চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মঞ্জিল, অবশেষে তা শুষ্ক বাঁকা খেজুর ডালের ন্যায় হয়ে যায়।"

সংখ্যা ও নাম:

আরব জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মুফাসসিরদের মতে চাঁদের মঞ্জিল হলো ২৮টি। চাঁদ প্রতি রাতে একটি করে মঞ্জিল অতিক্রম করে। ২৯ বা ৩০ দিনে মাস পূর্ণ হয় এবং ১ বা ২ রাত চাঁদ অদৃশ্য থাকে (অমাবস্যা)।

মঞ্জিলগুলোর প্রসিদ্ধ নামগুলো হলো:

১. আশ-শারাঈন (الشرطين) ২. আল-বুতাইন ৩. আছ-ছুরাইয়া ৪. আদ-দাবরান ৫. আল-হাক'আ ৬. আল-হানাআ ৭. আয-যিরা ৮. আন-নাসরা ৯. আত-তারফ ১০. আল-জাবহা ১১. আয-যুবরা ১২. আস-সারফা ১৩. আল-আওয়া ১৪. আস-সিমাক ১৫. আল-গফর ১৬. আয-যুবানা ১৭. আল-ইকলিল ১৮. আল-কলব ১৯. আশ-শাওলা ২০. আন-না'আইম ২১. আল-বালদা ২২. সা'দুজ জাবিহ ২৩. সা'দুল বুলা ২৪. সা'দুস সউদ ২৫. সা'দুল আখবিয়া ২৬. আল-ফারগুল আউয়াল ২৭. আল-ফারগুস সানি এবং ২৮. বাতনুল হুত।

উপসংহার:

এই মঞ্জিলগুলো আল্লাহর কুদরতের এক নিখুঁত ক্যালেন্ডার, যার মাধ্যমে মানুষ বছর ও মাসের হিসাব রাখতে পারে।

---

৮৯. প্রশ্ন: সূরা ইয়াসীন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো লেখ। (اُكْتُبِ التَّعْلِيمَاتِ الْحَاصِلَةَ عَنْ سُورَةِ يس)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃৎপিণ্ড। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের মৌলিক শিক্ষাগুলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রাপ্ত শিক্ষা (التَّعْلِيمَاتُ الْمُسْتَفَادَةُ):

১. কুরআনের সত্যতা: আল-কুরআন কোনো কবির কাব্য বা জাদুকরের কথা নয়; বরং এটি প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কিতাব, যা মানুষকে সরল পথ দেখায়।

২. নবীর প্রতি ভালোবাসা: হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তাঁকে 'ইয়াসীন' বলে সম্বোধন করে সম্মান জানানো হয়েছে। তাঁর অনুসরণ ছাড়া পরকালে মুক্তি অসম্ভব।

৩. প্রকৃতির নিদর্শন: মৃত জমিকে বৃষ্টি দিয়ে জীবিত করা, রাত-দিনের আবর্তন, সূর্য-চন্দ্রের সুশৃঙ্খল গতিপথ—এসবই আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ। এগুলো নিয়ে গবেষণা করা মুমিনের দায়িত্ব।

৪. দাওয়াতের দায়িত্ব: হাবিব নাজ্জারের ঘটনা শিক্ষা দেয় যে, সত্য প্রচারে নিজের জান দিতেও কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। সমাজের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হকের দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে।

৫. পরকালের জবাবদিহিতা: কিয়ামতের দিন মানুষের মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে; তখন হাত কথা বলবে এবং পা সাক্ষ্য দেবে। এই ভয়াবহ দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য।

৬. আল্লাহর অসীম ক্ষমতা: আল্লাহ যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন কেবল বলেন 'হও' (كُنْ), আর সাথে সাথে তা হয়ে যায় (فَيَكُونُ)। এই আকিদা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

উপসংহার:

সূরা ইয়াসীন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতই চিরস্থায়ী। তাই শিরক মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।